পলিসি পেপার

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮
কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে

আলী রীয়াজ

cgs Centre for Governance Studies

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে

এপ্রিল ২০২১

https://freedominfo.net/reports

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইসড অধ্যাপক এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। তিনি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এর উপদেষ্টামন্ডলীর একজন সদস্য।

গবেষণা সহকারী

আরিফ আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত।

আরমান মিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত।

এই গবেষণা প্রকল্পটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (এনইডি) এর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে।

আলোকচিত্রী
সুমাইয়া জাহিদ

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করে এবং এই সব বিষয়ে একাডেমিক পরিসর, সরকার, ব্যক্তিখাত, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- http://cgs-bd.com/

cgs Centre for Governance Studies

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

গত প্রায় তিন বছর ধরে বাংলাদেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত হবার পরই এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। তখনই আপত্তি ওঠে যে, এই আইনের ফলে দেশে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও সরকার ২০১৮ সালের অক্টোবরে এই আইন চালু করেন। এই আইনের বিভিন্ন ধারার সম্ভাব্য অপপ্রয়োগ নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে যে সব সংগঠন কাজ করে তাঁরা আইনের খসড়া পর্যায় থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে, দেশের সম্পাদক পরিষদ সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধারা কী ধরণের নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে সেই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরে ('সম্পাদক পরিষদের ব্যাখ্যা -কেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা করছি', *ডেইলি স্টার*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। সম্পাদক পরিষদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা হয় এবং তাদের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে এই বিষয়ে সরকার মনোযোগ দেবে। কিন্তু সরকার একমাত্র পুলিশের আপত্তিকে গ্রহণ করে এই আইন চালু করে; 'আইনের ৪৩ ধারায় তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালকের অনুমোদন নেওয়ার বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে অনুমোদনের বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। ফলে পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পায়' ('কারো আপত্তিই আমলে নেয়া হয়নি,' *প্রথম আলো*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১)। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয় যে, এই আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে না এবং এই আইন নিয়ে কারো ভীত হবার কারণ নেই।

সম্পাদক পরিষদ ২০২০ সালের মে মাসে বলেছে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে তাঁরা যে ভয় পেয়েছিলেন তা এখন 'দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা'য় পরিণত হয়েছে ('সম্পাদক পরিষদের বিবৃতি - ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সেই ভয়ই এখন দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা', *প্রথম আলো*, ২০ মে ২০২০)।

সেই বাস্তবতার রূপ কী, কতটা ব্যাপকভাবে এই আইন ব্যবহৃত হচ্ছে, কারা অভিযুক্ত হচ্ছেন, কী ধরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন আইনটি চালু হবার দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে যাবার পরে তা বোঝার জন্যে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর পক্ষ থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয় । এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে মামলা, আটক এবং আইনী প্রক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এই সময়ে ৪২৬টি মামলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এতে অভিযুক্ত হয়েছেন মোট ৯১৩ জন। এই মামলাগুলোর ভিত্তিতে এই আইন প্রয়োগের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিযোগ ও মামলার ব্যাপারে তথ্য পাওয়া কঠিন

২০১৮ সালের অক্টোবরে এই আইন কার্যকর হয়। এই আইন ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন প্রস্তাব আকারে মন্ত্রীসভায় উপস্থাপন করা হয় সেই সময়ে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে প্রস্তাবিত আইনে এমন সব ধারা রাখা হচ্ছে যাতে করে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই আশঙ্কার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ ছিলো, কেননা এর পূর্বসূরি আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬, যা ২০১৩ সালে সংশোধিত হয় তাঁর আওতায় মামলার সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে যে হিসেব দেয়া হয়েছিলো তা উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেদনে ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র সাইবার ট্রাইব্যুনালের সূত্রে পাওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, "২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনটি মামলা নিয়ে ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পরের বছর ট্রাইব্যুনালে আসে ৩২টি।

২০১৫ সালে বিচারের জন্য আসে ১৫২টি মামলা। আর চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচারের জন্য মামলা এসেছে ১৫৬টি। এর বাইরে তদন্ত পর্যায়ে আছে ২৫০টি মামলা। অর্থাৎ বিচারাধীন ও তদন্তাধীন মিলে মোট মামলা ৫৯৩টি" (আসাদুজ্জামান, 'সাইবার অপরাধের মামলা হু হু করে বাড়ছে', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬)। আর্টিক্যাল ১৯- এর দেয়া তথ্যে জানা যায় যে, ২০১৮ সালে মোট ৭১টি মামলা রুজু করা হয়েছিলো তাঁর মধ্যে ৩৫টি ছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় (*নিউ এজ*, 'ডিএসএ কেইসেস এ্যারেস্ট ট্রেবল ইন এ ইয়ার', ৬ জানুয়ারি ২০২১)।

২০১৬ সালেই আরও কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত: এই আইনের ৫৭ ধারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহলে এ কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই অপরাধে সর্বোচ্চ ১৪ বছর ও সর্বনিম্ন ৭ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। এই ধারার মূল লক্ষ্য ছিলো ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়া। ২০১৬ সালেই দেখা যায় যে, সে পর্যন্ত ৯৪ শতাংশ মামলা হয়েছে বিতর্কিত ৫৭ ধারায়। পরের হিসাবে দেখা যায়, ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত এই আইনের আওতায় মামলা হয়েছিল ১ হাজার ৪১৭টি। এগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ মামলা হয়েছিল ৫৭ ধারায়। ২০১৮ সালে এই আইনের ৫৭ ধারা বাতিলের আগে পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৭টি মামলা হয় ৫৭ ধারায়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই সব মামলার অধিকাংশই আসামীই খালাস পেয়েছেন। 'আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৬৬ শতাংশ মামলারই সব আসামি খালাস পেয়েছেন। তার মানে, মাত্র ৩৪ শতাংশ মামলা প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত পর্যায়েই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ১৩ শতাংশ মামলা। পুলিশ সেগুলোর বিষয়ে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে।' জানা যায়, 'তদন্তে ঘটনার সত্যতা না পেয়ে গত তিন বছরে ৪৬টি মামলায় পুলিশ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে' (আসাদুজ্জামান, 'সাইবার অপরাধের মামলা হু হু করে বাড়ছে', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

২০১৮ সালে আশংকা করা হয়েছিলো ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালু হলে মামলার সংখ্যা বাড়বে (আলী রীয়াজ, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার স্বার্থে', *প্রথম আলো*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। বাস্তবেও তাই হয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আইনটির দুই বছর পূর্ণ হলে দেখা যায় যে, এই আইনে মামলার সংখ্যা বেড়ে এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে (আসাদুজ্জামান, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন - ২ বছরে মামলা হাজার ছাড়াল', *প্রথম আলো* ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)। ২০২১ সালের মার্চ মাসে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) পুলিশ সদর দপ্তর থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে মামলা হয়েছে ১২৬টি, ২০১৯ সালে ৭৩১টি এবং ২০২০ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৬৯৯টি। অর্থাৎ কমপক্ষে ১৫৫৯টি মামলা হয়েছে। সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ৮০০-এর বেশি মামলা হয়েছে।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং সংবাদপত্র যে হিসেবে প্রকাশ করে তার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইংরেজি দৈনিক *ফাইনেন্সিয়াল এক্সপ্রেস*-এ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে ৬৩০টি মামলা হয়েছে

(শহিদুজ্জামান খান, 'স্ট্রেনথেনিং সাইবার সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট', *ফাইনেন্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের দেয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে ১৩০টি মামলা হয়েছে (*নিউ এজ*, 'ডিএসএ কেইসেস এ্যারেস্ট ট্রেবল ইন এ ইয়ার', ৬ জানুয়ারি ২০২১)। বিভিন্ন সূত্রের এই পার্থক্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট তথ্য প্রদানে অনীহা।

আমরা কী জানি

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর পক্ষ থেকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বিষয়ক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা ১) সরকার অনুমোদিত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া; ২) অভিযুক্ত কিংবা তাদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব; ৩) অভিযুক্তের আইনজীবী; ৪) থানা ও অন্যান্য সংশ্লিস্ট দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের পর যাচাই-বাছাই করে সর্বোচ্চ নির্ভুল ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ডাটাবেসে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ৪২৬টি মামলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এতে অভিযুক্ত হয়েছেন মোট ৯১৩ জন। এই মামলাগুলোর ভিত্তিতে এই আইনের প্রয়োগের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

কারা অভিযুক্ত হচ্ছেন, কারা আটক হচ্ছেন

অভিযুক্ত ৯১৩ জনের ৭৩৩ জনের পেশা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। এই হিসেবে দেখা যায় যে, মোট অভিযুক্তের ১১ শতাংশের বেশি হচ্ছেন রাজনীতিবিদ এবং ১০ শতাংশের বেশি হচ্ছে সাংবাদিক। যাদের পেশা জানা গেছে তাঁদের মধ্যে এই হার হচ্ছে যথাক্রমে ১৪.১ এবং ১৩.২ (সারণী-১)।

সারণী ১ - অভিযুক্তদের পেশা

পেশা ও সংখ্যা		মোট %	প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মোট %
সাংবাদিক	৯৭	১০.৬	১৩.২
শিক্ষক	২২	২.৪	৩.
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	৫	০.৫	০.৭
রাজনীতিবিদ	১০৪	১১.৪	১৪.১
শিক্ষার্থী	৩০	৩.৩	৪.১
সরকারী চাকরিজীবী	১৭	১.৯	২.৩
বেসরকারী চাকরিজীবী	১৪	১.৫	১.৯
ব্যবসায়ী	১৫	১.৬	২
আইনজীবী	৩	০.৩	০.৪
অন্যান্য পেশা	৪২৯	৪৭	৫৮.৩
পেশা পাওয়া যায়নি	১৭৭	১৯.৪	

এই সব অভিযুক্তের মধ্যে আমরা ২৯৯ জনের বয়স শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সবেচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন যাদের বয়স ২৬ থেকে ৪০ বছর - ৪৬ শতাংশের বেশি হচ্ছেন এই বয়সী, আমরা যদি ১৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত বয়স বিবেচনা করি তবে তা দাঁড়ায় ৮০ শতাংশের বেশি (সারণী-২)।

সারণী ২ - অভিযুক্তদের বয়স

বয়স		মোট %	প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মোট %
অনূর্ধ্ব ১৮	৯	১	৩
১৮-২৫	১০৩	১১.৩	৩৪.৪
২৬-৪০	১৩৯	১৫.২	৪৬.৫
৪১-৫৫	৪৫	৪.৯	১৫.১
৫৫ এর বেশী	৩	০.৩	১
বয়স পাওয়া যায়নি	৬১৪	৬৭.৩	

আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা হচ্ছে ২৭৩; যাদের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করেছি ২৪০ জনের পেশা। এদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ হচ্ছেন সাংবাদিক, ১১.৩ শতাংশ হচ্ছেন রাজনীতিবিদ। লক্ষণীয় যে, রাজনীতিবিদরা বেশি অভিযুক্ত হলেও আটকের তালিকায় সাংবাদিকরাই বেশি। এর পরে আছেন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা (সারণী-৩)।

সারণী ৩ - আটক ব্যক্তিদের পেশা

পেশা ও সংখ্যা		মোট %	প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মোট %
সাংবাদিক	৩১	১১.৪	১২.৯
শিক্ষক	১৫	৫.৫	৬.৩
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	৩	১.১	১.৩
রাজনীতিবিদ	২৭	৯.৯	১১.৩
শিক্ষার্থী	১৭	৬.২	৭.১
সরকারী চাকরিজীবী	৫	১.৮	২.১
বেসরকারী চাকরিজীবী	৭	২.৬	২.৯
ব্যবসায়ী	৬	২.২	২.৫
আইনজীবী	২	০.৭	০.৮
অন্যান্য পেশা	১২৭	৪৬.৫	৫২.৯
পেশা পাওয়া যায়নি	৩৩	১২.১	

আটক ব্যক্তিদের বয়সের হিসেবে ৮০ শতাংশের বেশি হচ্ছেন ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, ১৮ বছরের কম বয়সী আছেন প্রায় ৩ শতাংশ (সারণী-৪)।

সারণী ৪ - আটক ব্যক্তিদের বয়স

বয়স		মোট %	প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মোট %
অনূর্ধ্ব ১৮	৪	১.৫	২.৯
১৮-২৫	৪২	১৫.৪	৩০
২৬-৪০	৭১	২৬	৫০.৭
৪১-৫৫	২২	৮.১	১৫.৭
৫৫ এর বেশী	১	০.৪	০.৭
বয়স পাওয়া যায়নি	১৩৩	৪৮.৭	

কোন ধরণের সাংবাদিকরা অভিযুক্ত হচ্ছেন, আটক হচ্ছেন

আমাদের হিসেবে ৯৭ জন সাংবাদিক অভিযুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক হচ্ছেন ৩২ জন, ৫৮ জন হচ্ছেন স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিক; ৭ জনের বিষয়ে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই। ঢাকার বাইরের অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন। যে নব্বই জনের তথ্য পাওয়া গেছে তাঁর মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গেই যুক্ত বেশি মোট ৫০ জন, যা অর্ধেকেরও বেশি। এর পরে আছে অনলাইন মিডিয়া, এক-তৃতীয়াংশ (৩০ জন) সাংবাদিক যুক্ত অনলাইন মিডিয়ার সঙ্গে (সারণী-৫)।

সারণী ৫ - অভিযুক্ত সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্র

জাতীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিক	টেলিভিশন চ্যানেল	৯
	পত্রিকা	২১
	অনলাইন	২
স্থানীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিক	টেলিভিশন চ্যানেল	১
	পত্রিকা	২৯
	অনলাইন	২৮
পাওয়া যায়নি		৭
	সর্বমোট	৯৭

আটক সাংবাদিকের সংখ্যা ৩১ জন, তাঁদের মধ্যে ১৭ জনই জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত নন (সারণী -৬)।

সারণী ৬ - আটক সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্র

জাতীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিক	টেলিভিশন চ্যানেল	৪
	পত্রিকা	৬
	অনলাইন	১
স্থানীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিক	টেলিভিশন চ্যানেল	১
	পত্রিকা	১০
	অনলাইন	৬
পাওয়া যায়নি		৩
	সর্বমোট	৩১

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা, আটক

এখন পর্যন্ত ২২ জন অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে; তাতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। মোট অভিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে ২৭ শতাংশ কলেজ শিক্ষক এবং ২৭ শতাংশ হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (সারণী-৭)।

সারণী ৭ - অভিযুক্ত শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্র

	সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪
উচ্চ বিদ্যালয়	১
কলেজ	৬
বিশ্ববিদ্যালয়	৬
মাদ্রাসা	৫
সর্বমোট	২২

বিভিন্ন মামলায় মোট ১৫ জন শিক্ষক আটক হয়েছেন; সবেচেয়ে বেশি আটক হয়েছেন কলেজ শিক্ষকরা। আটক শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছেন কলেজ শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক হচ্ছে ২৬.৬৬ শতাংশ (সারণী-৮)।

সারণী ৮ - আটক শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্র

	সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪
উচ্চ বিদ্যালয়	১
কলেজ	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	১
মাদ্রাসা	৪
সর্বমোট	১৫

সরকারী কর্মচারীরা অভিযুক্ত হয়েছেন

আমাদের সংগৃহীত ৪২৬টি মামলায় অভিযুক্ত যে ৭৩৩ জনের পেশা জানা গেছে তাঁদের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরাও আছেন। এই সংখ্যা ১৭ জন। তাঁর মধ্যে পুলিশে কর্মরত আছেন ৬ জন (সারণী-৯)।

সারণী ৯ - অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র

	সংখ্যা
সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	১
অফিস সহকারী, উপজেলা সমবায় অফিস	১
বাংলাদেশ পুলিশ	৬
কার্যনির্বাহী, ফুলবাড়িয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় (পিআইও)	১
অডিটর, জেলা অ্যাকাউন্টস এবং ফিনান্স অফিস	১
নগদ সরকার, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	৪
অফিস সহকারী/কম্পিউটার টাইপিস্ট, উপজেলা নির্বাচন অফিস	১
পাওয়া যায়নি	১
সর্বমোট	১৭

কারা অভিযোগ করছেন?

আমাদের হাতে যে ৪২৬টি মামলার বিস্তারিত আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে। এই সব ক্ষেত্রে কেবল ভিকটিমরাই যে অভিযোগ করেছেন তা নয়। দেখা গেছে যে, অভিযোগকারীরা অন্যদের মানহানি হয়েছে এমন অভিযোগেই মামলা করেছেন বেশি। আমরা ৩৫৭টি মামলায় অভিযোগকারীদের পরিচিতি সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁর মধ্যে ৪৫টি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মামলা করেছে, এই হার আমাদের জানা অভিযোগকারীদের ১২.৬ শতাংশ (সারণী-১০)।

সারণি ১০ - অভিযোগকারীদের পরিচিতি

	সংখ্যা	মোট %	প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মোট %
রাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	৫	১.২	১.৪
পুলিশ	৩৬	৮.৫	১০.১
অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	৪	০.৯	১.১
একক ব্যক্তি	১৭০	৩৯.৯	৪৭.৬
রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত	৭৪	১৭.৪	২০.৭
নির্বাচিত জন প্রতিনিধি	১৯	৪.৫	৫.৩
ব্যবসায়ী	৭	১.৬	২
শিক্ষক	১৩	৩.১	৩.৬
সাংবাদিক	১১	২.৬	৩.১
আইনজীবী	৯	২.১	২.৫
শিক্ষার্থী	৯	২.১	২.৫
পাওয়া যায়নি	৬৯	১৬.২	

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ৭৪ জন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি হচ্ছেন ১৯ জন অর্থাৎ মোট ৯৩ জন কোনো না কোনো ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে ৭৬ জনের সরাসরি ক্ষমতাসীন দল এবং অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ আমরা যাদের দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় শনাক্ত করতে পেরেছি তাঁদের ৮২ শতাংশ হচ্ছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও কর্মী (সারণী-১১)।

সারণি ১১ - অভিযোগকারীদের রাজনৈতিক পরিচয়

	সংখ্যা	মোট %
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২	৩৪.৪
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ	১০	১০.৮
বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ	৫	৫.৪
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ	২৯	৩১.২
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১	১.১
অন্যান্য	১৬	১৭.২

যে উনিশ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে শনাক্ত করা হয়েছে, তাঁদের বিস্তারিত পরিচয়ে দেখা যায় যে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এদের মধ্যে ৩ জন সংসদ সদস্যও আছেন (সারণী-১২)।

সারণী ১২ - অভিযোগকারী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচয়

	সংখ্যা
সংসদ সদস্য	৩
সিটি কর্পোরেশন মেয়র	১
পৌরসভার প্যানেল মেয়র	২
ওয়ার্ড কউন্সিলর	৪
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	৬
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	২
উপজেলা পরিষদ ভাইস-চেয়ারম্যান	১
সর্বমোট	১৯

কোন অভিযোগে মামলা, কারা অভিযুক্ত, কারা অভিযোগকারী

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে অপরাধ এবং দণ্ড বিষয়ক ধারা হচ্ছে ২২টি; কিন্তু যে সব মামলার বিস্তারিত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব মিলে ১৬টি ধারা ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ধারায়ও মামলা করা হয়েছে (সারণী -১৩)।

সারণী ১৩ - কোন ধারায় কত মামলা

ধারা সমূহ	ধারায় নিবন্ধিত মামলা সংখ্যা	প্রতিটি ধারায় অভিযুক্তের সংখ্যা
২১	৩	৩৫
২২	৩	১৩
২৩	১০	৪৬
২৪	১৬	৭৮
২৫	৩৭	১১২
২৬	৮	১৩
২৭	১	১
২৮	১৩	১৫
২৯	৩৯	৯১
৩০	২	৩
৩১	২৯	৫৭
৩২	১	৫
৩৩	১	৪
৩৪	১	১০
৩৫	১৮	৯২
৩৬	১	৫

মামলার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ২৯ ধারা। ৩৯টি মামলা করা হয়েছে এই ধারায়, তাতে ৯১ জন অভিযুক্ত হয়েছেন। এই ধারা মানহানিকর তথ্য প্রচার বিষয়ক। ["এতে বলা হয়েছে ২৯। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"]

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ২৫ ধারা। যাতে ১১২ জন অভিযুক্ত হয়েছেন ৩৭টি মামলায়। এই ধারা হচ্ছে আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি বিষয়ক। ["২৫। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে, (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা (খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুন্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত

আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"] এ যাবত যত আলোচনা হয়েছে তাতে এই ধারা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা এবং আপত্তি করা হয়েছে।

এই দুই ধারায় যারা অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের পেশাগত পরিচয় সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ২৯ ধারায় ৩৯টি মামলায় অভিযুক্ত ৯১ জনের মধ্যে ৮৯ জনের পেশা জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছেন রাজনীতিবিদ -৪০জন; তারপরে আছেন সাংবাদিকরা ১৪ জন (সারণী-১৪)।

সারণী ১৪ - ২৯ ধারায় অভিযুক্তদের পেশাগত পরিচিতি

পেশা	সংখ্যা
সাংবাদিক	১৪
শিক্ষক	৫
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	০
রাজনীতিবিদ	৪০
শিক্ষার্থী	২
সরকারী চাকরিজীবী	০
বেসরকারী চাকরিজীবী	১
ব্যবসায়ী	০
আইনজীবী	১
অন্যান্য পেশা	২৬
পেশা পাওয়া যায়নি	২
সর্বমোট	৯১

সর্বাধিক আলোচিত ২৫ ধারায় ৩৭টি মামলায় অভিযুক্তের সংখ্যা ১১২ জন; ১০৮ জনের পেশা জানা গেছে। এদের মধ্যে ৩৭ জন রাজনীতিবিদ এবং ১২ জন সাংবাদিক (সারণী-১৫)।

সারণী ১৫ - ২৫ ধারায় অভিযুক্তদের পেশা

পেশা	সংখ্যা
সাংবাদিক	১২
শিক্ষক	৩
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	৪
রাজনীতিবিদ	৩৭
শিক্ষার্থী	১
সরকারী চাকরিজীবী	৫
বেসরকারী চাকরিজীবী	১
ব্যবসায়ী	২
আইনজীবী	১
অন্যান্য পেশা	৪২
পেশা পাওয়া যায়নি	৪
সর্বমোট	১১২

এই দুটি ধারা যে সব মামলা হয়েছে তাতে অভিযোগকারীদের পেশাগত পরিচয় পাওয়া গেছে ২৯ ধারার ক্ষেত্রে ৩৮ জনের এবং ২৫ ধারার ক্ষেত্রে ৩৬ জনের। ২৯ ধারায় সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন রাজনীতিবিদরা; ২৫ ধারায় একই অবস্থা লক্ষ করা গেছে (সারণী-১৬ এবং সারণী-১৭)।

সারণী ১৬ - ২৯ ধারায় অভিযোগকারীদের পেশাগত পরিচয়

পেশা	সংখ্যা
সাংবাদিক	৪
শিক্ষক	৪
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	০
রাজনীতিবিদ	১৪
শিক্ষার্থী	১
সরকারী চাকরিজীবী	২
বেসরকারী চাকরিজীবী	১
ব্যবসায়ী	০
আইনজীবী	৩
অন্যান্য পেশা	৯
পেশা পাওয়া যায়নি	১
সর্বমোট	৩৯

সারণী ১৭ -২৫ ধারায় অভিযোগকারীদের পেশাগত পরিচয়

পেশা	সংখ্যা
সাংবাদিক	৩
শিক্ষক	৪
এনজিও এবং সামাজিক কর্মী	০
রাজনীতিবিদ	১১
শিক্ষার্থী	১
সরকারী চাকরিজীবী	৫
বেসরকারী চাকরিজীবী	১
ব্যবসায়ী	১
আইনজীবী	১
অন্যান্য পেশা	৯
পেশা পাওয়া যায়নি	১
সর্বমোট	৩৭

মামলা, তদন্ত প্রতিবেদন এবং জামিনের প্রশ্ন

সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক মামলা এবং আটকের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। অধিকাংশ মামলায় একাধিক ব্যক্তি অভিযুক্ত হচ্ছেন; ফলে মামলার চেয়ে অভিযুক্ত বেশি। কিন্তু এই সব মামলার নিষ্পত্তির জন্যে আছে মাত্র একটি আদালত এবং সেখানে মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, এগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে সরকারের তৎপরতাই নেই। ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই এই আদালতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ২৬০টি মামলা। এ যাবত মাত্র ২১টি মামলায় সাজা দেয়া হয়েছে ২০টি আইসিটি অ্যাক্টের আওতায় এবং ১টি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায়। ২০২০ সালে এই আদালতে ১২৫টি ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দিয়েছে, ১১৪টি মামলায় সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার একটি বড় দুর্বলতা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না, কেননা এই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনেক অভিযুক্ত বিনা বিচারে আটক থাকেন এবং যে সব মামলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়াদি জড়িত সেহেতু অভিযুক্তরা সমাজে অন্যান্যভাবেও নিগৃহীত হতে থাকেন।

এক্ষেত্রে আরও লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে যেহেতু পুলিশ যে কোনো অবস্থায় কোনও রকম পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে আটক করতে পারেন সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই আটকের পরে মামলা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মামলা দেয়ার পরে পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার কথা যার ভিত্তিতে চার্জ গঠন হবে। আইনে বলা আছে ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ১৫ দিন সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ৭৫ দিন পার হওয়ার পর তাঁদের কিছু করার থাকবে না। এরপর তা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একাধিক মামলায় এই তদন্ত প্রতবেদন

নির্ধারিত ৭৫ দিনের মধ্যে দেয়া না হলেও অভিযুক্ত আটক থাকছেন এবং বিচারের আগেই তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই স্মরণ করবো মুশতাক আহমদের কথা, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে অভিযুক্ত হবার পরে তিনি ১০ মাস আটক ছিলেন এবং কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আর কত জন আটক আছেন তা কি আমরা জানি?

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তা হলো জামিনের বিষয়। আইনে বলা হচ্ছে যে, এর ১৪টি ধারা জামিন অযোগ্য। কিন্তু যে কোন জামিন অযোগ্য আইনের ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও বিচারিক আদালত চাইলে একজন অভিযুক্তকে জামিন দিতে পারেন। যে কারণে এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের অনেকে জামিন পেয়েছেন, আবার অনেকে পাননি। সাম্প্রতিক কালে এই বিষয়টি সামনে এসেছে এই কারণে যে আদালত মুশতাক আহমদের জামিনের আবেদন ছয়বার নাকচ করে দিয়েছেন; অথচ এই একই মামলায় আরও কয়েকজনকে আদালত জামিন দিয়েছেন। মুশতাকের মৃত্যুর পরে ঐ মামলায় অভিযুক্তদের একজন কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর ৩০০ দিন কারাবন্দি থাকার পর জামিন পান। আদালত কোন বিবেচনা থেকে একই ধারায় অভিযুক্তদের জামিন দেন এবং কেন দেন না সেই বিষয়ে কোন ধরণের স্বচ্ছতা লক্ষ করা যায়নি।

উপসংহার

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৮ গত প্রায় আড়াই বছরে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এই গবেষণা প্রতিবেদনে তার কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। এই তথ্যগুলো এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগের দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে, এই আইন সাংবাদিকদের বিশেষত স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপরে এবং তরুণদের ওপরে অসমানুপতিকভাবে প্রভাব ফেলছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই আইন একটি বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মী ও সমর্থকরা এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে এক ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতির সূচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

Centre for
Governance Studies

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০২৫৮৩১০২১৭, +৮৮০২৯৩৫৪৯০২ +৮৮০২৯৩৪৩১০৯
ইমেল : ed@cgs-bd.com
www.cgs-bd.com